বিশেষভাবে সক্ষম বাচ্চাদের বিকাশে অভিভাবকত্ব এবং শিক্ষার গুরুত্ব কতটা? আলোচনায় সাইকোথেরাপিস্ট তথা কাউন্সেলর মিনু বুধিয়া। স্পেশ্যাল এডুকেশনের পরামর্শে মাদার অ্যান্ড চাইল্ড স্কুলের ফাউন্ডার ডিরেক্টর ড. অভয় কৃপালানি। লিখছেন সায়নী দাশশর্মা।

প্রতিটা শিশুর বেড়ে ওঠার পিছনেই তার পরিবার, বাবা-মা এবং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের বড় ভূমিকা থাকে। শিশুর যাবতীয় প্রাথমিক শিক্ষা, চরিত্র গঠনের দায়িত্ব অভিভাবকদেরই। পাশাপাশি একটা বয়স অবধি বিভিন্ন প্রতিকূলতা থেকে সন্তানকে রক্ষা করার বিকাশের পথে তৈরি হওয়া সব বাধা-বিপত্তির বিরুদ্ধেও তাঁদেরই ঢাল হয়ে দাঁড়াতে হয়। আবার সমাজের মূলস্রোতে টিকে থাকতে, তথা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য প্রয়োজন হয় যথাযথ শিক্ষার। শুধু পুঁথিগত বিদ্যা নয়, জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ পাঠই শিশুরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে অর্জন করে। সন্তান বিশেষভাবে সক্ষম হলেও এই প্রয়োজনগুলো কিন্তু বদলায় না। হয়তো তাদের প্রতিকূলতা আলাদা, প্রয়োজন ভিন্ন, তবে অভিভাবকত্ব এবং শিক্ষার প্রয়োজন তাদের ক্ষেত্রেও সমান। তাই সমাজের তথাকথিত 'স্বাভাবিক' স্তরে সন্তানের জায়গা তৈরি করতে, স্পেশ্যাল পেরেন্টদের গোড়া থেকেই এই দু'টো বিষয়ে নজর রাখা জরুরি...

বাবা-মায়ের কর্তব্য

বাচ্চা বিশেষভাবে সক্ষম, এই সত্যিটার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার চ্যালেঞ্জই স্পেশ্যাল পেরেন্টদের জন্য সবচেয়ে কঠিন। একবার সেই বাধা পেরিয়ে গেলে বাকি পথ চলা তুলনায় সহজ। সব অভিভাবকদেরই সন্তানের প্রয়োজন বুঝে সেই মতো তাকে বড় করে তোলা, তার মতো করে পথ চলতে শেখানো জরুরি। তবে যেহেতু এ ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জগুলো আলাদা, তাই সন্তানের প্রয়োজন বুঝতে বাবা-মায়েদের নিজেদের প্রস্তুত করা বিশেষভাবে প্রয়োজন। বই পড়লে, স্পেশ্যাল কোর্স বা সেমিনারে অংশগ্রহণ করলে বা স্পেশ্যাল এডুকেশনের প্রশিক্ষণ নিলে সন্তানকে পথ দেখাতে সুবিধা হবে। অভিভাবক নিজে এই বিষয়ে যত জানবেন, ততই সন্তানকে বুঝতে সুবিধে হবে। সন্তানের যাবতীয় অভ্যাস, তার মুড সুইং, শারীরিক ছোট-বড় পরিবর্তন, খাদ্যাভ্যাস ইত্যাদি প্রতিটা বিষয়েই স্পেশ্যাল পেরেন্টদের সতর্ক থাকা প্রয়োজন। শুধু তাই নয়, এক্ষেত্রে সন্তানকে আর্থিক এবং মানসিকভাবে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করাও প্রাথমিকভাবে বাবা-মায়ের দায়িত্ব। আর্থিক স্বাধীনতার জন্য ছোট থেকেই সঞ্চয়ের প্রতি নজর দেওয়া জরুরি। যদি একাধিক সন্তান থাকে, সে ক্ষেত্রে স্পেশ্যাল চাইল্ডের সঙ্গে তাদের বন্ডিংয়ের প্রতিও জোর দিন। কথোপকথনের মাধ্যমে বাকি সন্তানদের ওর সমস্যা, পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত করুন। আপনি যেমন স্পেশ্যাল পেরেন্ট, তেমনই ওরাও যে স্পেশ্যাল সিবলিং, এটা বুঝতে শেখান। দৈনন্দিন জীবনের ছোটখাটো বিষয়ে ওদের একসঙ্গে সামিল করুন, যাতে সবার মধ্যে সহজ,

যেহেতু চ্যালেঞ্জগুলো আলাদা, তাই সন্তানের প্রয়োজন বুঝতে স্পেশ্যাল পেরেন্টদের নিজেদের প্রস্তুত করা বিশেষভাবে প্রয়োজন।

"যদি সন্তানকে তার মতো করে গ্রহণ করতে, ভালবাসতে পারেন, তাহলে সমাজ সেই মনোবল ভাঙতে পারবে না।" — মিনু বুধিয়া

স্বাভাবিক সম্পর্ক তৈরি হয়। এতে পরবর্তীকালে ভাই-বোনেরাই কেয়ারগিভারের ভূমিকা নিতে পারবে।

স্বাবলম্বী করে তুলুন

বিশেষভাবে সক্ষম সন্তানকে স্বাবলম্বী করে তুলতে হলে তার চাহিদা, ইচ্ছে-আকাঙ্ক্ষাকে গুরুত্ব দেওয়া ভীষণ জরুরি। ওদের নিজস্ব ছন্দে, নিজস্ব গতিতে সবকিছু শিখতে দিন। মনে রাখবেন, প্রত্যেকেই কিন্তু স্বতন্ত্র। প্রত্যেকে নিজের মতো করে শিখবে, জানবে। যদি বাচ্চা শারীরিকভাবে সক্ষম হয়, সেক্ষেত্রে গোড়া থেকেই বেসিক জিনিসগুলো শেখান। পার্সোনাল হাইজিন মেনে চলা, অর্থাৎ হাত ধোওয়া, টয়লেটের ব্যবহার, নিজেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, স্নান করা, দাঁত ব্রাশ করা, শ্যাম্পু করা ইত্যাদির অভ্যেস করান। নিজেকে গ্রুমড রাখাও জরুরি। নিয়মিত নখ কাটা, চুল-দাড়ি ট্রিম করা বা মেয়েদের ক্ষেত্রে ওয়্যাক্সিং, শেভিং ইত্যাদি অভ্যাস থাকা ভাল। বিশেষভাবে সক্ষম টিনএজার মেয়েদের ক্ষেত্রে অল্পবিস্তর মেক-আপ করা বা ছেলেদের হেয়ার জেল, মুজ় ইত্যাদি ব্যবহারের অভ্যাস থাকলে ভাল। মোট কথা, নিজের প্রতি যত্ন নেওয়া শেখাতে হবে। এতে ওদের আত্মবিশ্বাসও বাড়বে।

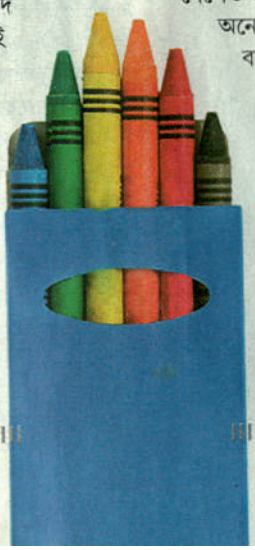

বাবা-মা হিসেবে আপনার সন্তানকে ঘিরে অনেক পরিকল্পনাই থাকতে পারে। তবে ওদেরও যে নিজস্ব শেখার ক্ষমতা রয়েছে, সেটা ভুলে যাবেন না। যা যা শিক্ষা ওকে দিতে চান, সেটা ওর ক্ষমতা বুঝে দিন। আত্মবিশ্বাস তখনই বাড়বে, যখন ওদের মানসিক বয়স অনুযায়ী শিক্ষা এবং সামাজিকতার পাঠ পড়ানো হবে। কোনও কিছু শেখাতে শেখাতে তখনই প্রশ্ন করুন, যখন আপনি নিজে নিশ্চিত হবেন যে ও উত্তর দিতে পারবে। কোনও খেলা শেখানোর সময় একদম প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করুন। ওদের যদি তার চেয়ে বেশি শেখার ক্ষমতা থাকেও, তাও ইজ়ি লেভেল থেকেই শুরু করুন। প্রথম দিকে খেলতে খেলতে যদি ওরা জিততে শুরু করে, সে ক্ষেত্রে ওদের আগ্রহও বাড়বে এবং আরও খেলার উৎসাহ পাবে। এরপর ধীরে ধীরে কঠিন লেভেলে গেলেও ওদের শেখার আগ্রহ বজায় থাকবে।

অনেক অভিভাবকই নানা কারণে বিশেষভাবে সক্ষম বাচ্চাদের নিয়ে পারিবারিক অনুষ্ঠান বা সামাজিক গ্যাদারিংয়ে যেতে চান না। এতে তারা সোশ্যালাইজ় করাও শেখে না। পারিবারিক অনুষ্ঠানে নিয়ে গেলে, সকলের মধ্যে থাকলেও কিন্তু ওরা অনেক কিছু শিখবে। কনফিডেন্স তো পাবেই, এমনকী বিভিন্ন সামাজিক পরিস্থিতিতে কীভাবে আচরণ করা উচিত, তাও বুঝবে। বাড়িতে অতিথি এলে ওকেই বলুন তাঁদের ওয়েলকাম করতে। যদি সম্ভব হয়, ওদের চা-জল অফার করার মতো দায়িত্বও দিতে পারেন। যদি কোনও গ্যাদারিংয়ে কাউকে দেখলে সন্তান অস্বস্তি বোধ করে বা কেউ জড়িয়ে ধরতে চাইলে আপত্তি করে,

তাহলে জোর করবেন না। ওদের পার্সোনাল স্পেস এবং বাউন্ডারির সম্মান করা জরুরি।

যদি সন্তান নিজের পছন্দ-অপছন্দের কথা জানাতে সক্ষম হয়, সেক্ষেত্রে ওকে নিজের জিনিস নিজেই বাছতে বলুন। তা খাবার হোক বা পোশাক, এসির তাপমাত্রা হোক বা গান, ওদের স্বাচ্ছন্দ্য, পছন্দের গুরুত্ব দিন। যদি বাচ্চা অনেক চয়েসের মধ্যে কনফিউজ়ড হয়ে যায়, সে ক্ষেত্রে দু'টো জিনিস দিয়ে ওকে বলুন নিজের মতো পছন্দ করতে। এতে সিদ্ধান্ত নেওয়া বা পছন্দ-অপছন্দবোধ সম্পর্কে ওদের ধারণা তৈরি হবে। আবার যদি কোনও পোশাক ওর পছন্দ না হয়, সে ক্ষেত্রে তা জোর করেও পরাবেন না। যাই পরান না কেন, তা যেন পরিষ্কার ও উজ্জ্বল হয়, এবং দেখতেও ভাল লাগে। পুরনো, ছেঁড়া জামাকাপড় পরাবেন না। শুনতে খারাপ লাগলেও, এখনও আমরা এমন সমাজে থাকি, যেখানে পোশাক-আসাক সোশ্যাল স্ট্যাটাসের অন্যতম মাপকাঠি। ছোটরাও খুব সহজেই এই বিষয়গুলো শিখে নেয়। তাই ওদের যতটা সম্ভব প্রেজ়েন্টবল রাখার চেষ্টা করুন।

শিক্ষা, স্কুলিং এবং বাবা-মায়ের ভূমিকা

বিশেষভাবে সক্ষম বাচ্চাদের ক্ষেত্রে জীবনের প্রতিটা মুহূর্তই শিক্ষণীয়। আর তাই এ ক্ষেত্রে বাবা-মায়েদের ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্পেশ্যাল চাইল্ডরা মূলত পুনরাবৃত্তি থেকে শেখে। ফলে প্রতিদিন বাড়িতে যা বলা হচ্ছে বা করা হচ্ছে, তা ওরা আংশিকভাবে হলেও শেখে। সেই কারণেই ওদের বিভিন্ন ধরনের লাইফ স্কিল, দৈনন্দিন কাজ, পড়াশোনা বা খেলাধুলো শেখানোর কোনও ন্যূনতম বয়স হয় না। মোটামুটি তিন বছর বয়স থেকেই আর্লি ইন্টারভেনশন এডুকেশন শুরু করা যেতে পারে। প্রি-ভোকেশনাল এডুকেশন মোটামুটি ১০ বছর বয়স থেকে শুরু করা যেতে পারে। এছাড়া বাচ্চার শারীরিক শক্তি এবং

বুদ্ধিমত্তার উপর নির্ভর করে প্রয়োজন হলে কোনও স্পেশ্যাল টিউটর রাখতে পারেন। অথবা স্পেশ্যাল স্কুলেও ভর্তি করাতে পারেন। স্পেশ্যালাইজ়ড ইন্সটিটিউটে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক, প্রয়োজনীয় টুলস এবং বিশেষ সুযোগ-সুবিধা তো থাকেই, পাশাপাশি এই ধরনের স্কুলের সবচেয়ে বড় সুবিধে, এখানে বাচ্চারা সোশ্যালাইজ় করার সুযোগ পায়। স্পেশ্যাল চিলড্রেনদের কাছে স্পেশ্যাল স্কুল আসলে একটা নিরাপদ আশ্রয়, যেখানে নিজের মতো করে থাকায় কোনও বাধা নেই। কেউ সেখানে সমাজের ঠিক করে দেওয়া মাপকাঠিতে ওদের বিচার করে না। সেই কারণেই খুব লাজুক বা অত্যন্ত দুরন্ত বাচ্চারাও স্কুলে গিয়ে বন্ধুদের সাহচর্য উপভোগ করতে শেখে। আসলে, যতই আমরা সামাজিক ইনক্লুশনের কথা বলি না কেন, এই সমাজ এখনও ইকুয়ালিটির কনসেপ্টে অভ্যস্ত নয়। এখনও বিশেষভাবে সক্ষম বাচ্চাদের সাধারণ স্কুলে পাঠালে তারা প্রতিনিয়ত বুলিংয়ের শিকার হয়। ইনক্লুসিভ স্কুলেও কিন্তু এ ধরনের ঘটনা হামেশাই ঘটে, অথচ স্পেশ্যাল স্কুলে এমন ঘটনা

শোনা যায় না। আসলে সমাজের চোখে যারা 'স্বাভাবিক', তারা সেই চেনা বৃত্তের বাইরে বাকি সব কিছুই অস্বাভাবিক বলে ধরে নেয়। বিশেষভাবে সক্ষমদের প্রয়োজন, তাদের প্রতিকূলতা সম্পর্কে অন্যান্য বাচ্চাদের অবগত করা হয় না বলেই, এখনও এই ধরনের ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। তাই সন্তানকে সমাজের মূলস্রোতে মাথা উঁচু করে দাঁড় করাতে হলে সবার আগে তাদের প্রয়োজন বোঝার চেষ্টা করুন। ও কোন ধরনের পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারবে, কোন স্কুল ওর বেশি ভাল লাগছে, সেটা বুঝতে চেষ্টা করুন। স্রেফ নিজের ইচ্ছের তাগিদে সাধারণ স্কুলে ভর্তি করাবেন না। এতে সমাজের প্রতি ওর উলটো মনোভাব তৈরি হতে পারে।

ইনক্লুসিভ স্কুল মূলত দু'রকম হয়। বাচ্চার যদি বর্ডারলাইন বা মাইল্ড ইন্টেলেকচুয়াল চ্যালেঞ্জ থাকে, তারা সাধারণ স্কুলে পড়াশোনা করতে পারে। বা যদি সাধারণ স্কুলে স্পেশ্যাল চিলড্রেনদের জন্য বিশেষ ক্লাসরুমের ব্যবস্থা থাকে, সে ক্ষেত্রেও একই স্কুলে পড়াশোনা করার সুযোগ থাকে। কিন্তু স্পেশ্যাল চাইল্ডদের লার্নিং স্পেস এমন হওয়া দরকার, যেখানে তারা নিজের ছন্দে নতুন জিনিস শিখতে পারে বা যেখানে তাদের সমস্যাগুলো সকলে বুঝতে পারে। এতে ওদের নানা বিহেভিয়ারাল এবং ইমোশনাল সমস্যাও স্বাভাবিক হয়ে যায়। আর বাচ্চা সেই পরিবেশ কোথায় পাচ্ছে, সেটা বাবা-মাকেই বুঝতে হবে।

সমাজের বাধা পেরিয়ে...

এই প্রসঙ্গে বলব, আপনি আপনার সন্তানকে কীভাবে ট্রিট করছেন, তার উপরই নির্ভর করবে ওর সঙ্গে বাইরে কীভাবে ট্রিট করা হচ্ছে। বাবা-মা হিসেবে যদি সন্তানকে তার মতো করে গ্রহণ করতে পারেন, তাকে ভালবাসতে পারেন, পরিবার-পরিজনের কাছে সন্তানের কথা মন খুলে বলতে পারেন, তাহলে সমাজ সেই মনোবল ভাঙতে পারবে না কখনওই। কিছুক্ষেত্রে অবশ্য অভিভাবকদেরই ঢাল হয়ে দাঁড়াতে হবে, ওদের হয়ে প্রতিবাদ করতে হবে। এতে অন্তত কাছের মানুষদের কাছে টেকেন ফর গ্রান্টেড হওয়া থেকে সন্তানকে রক্ষা করতে পারবেন। অবশ্য প্রাথমিকভাবে সেই পথটা আপনাকেই খুঁজে নিতে হবে।

স্পেশ্যাল টিনদের ক্ষেত্রে

নানা ধরনের শারীরিক পরিবর্তন এবং হরমোনাল পরিবর্তনের কারণে স্পেশ্যাল টিনদের মধ্যে অহরহ মুড সুইং, অতিরিক্ত মেজাজ, খিটখিটে হাবভাব দেখা যায়। তাই বাচ্চারা এই বয়সে এলে অভিভাবকত্বের চ্যালেঞ্জগুলোও আরও বেড়ে যায়। অনেকক্ষেত্রেই বাবা-মায়েরা বুঝতে পারেন না, সন্তান কী চাইছে বা কেন চাইছে। মনে রাখবেন, এই বয়সে এই ধরনের বিহেভিয়ারাল পরিবর্তন কিন্তু ওদের ক্ষেত্রেও স্বাভাবিক। যারা নিজেদের চাহিদা, পছন্দ-অপছন্দের কথা মুখ ফুটে বলতে পারে, তারা নিজের সমস্যার কথাও জানাতে পারে। কিন্তু যারা সেটা পারে না, তাদের মধ্যে ফ্রাস্ট্রেশন তৈরি হতে পারে। পাশাপাশি শারীরিক পরিণতি থেকে শারীরিক চাহিদা তৈরি হয়, অন্য ধরনের অনুভূতি জাগতে শুরু করে মনে। এই বয়সে ওদের সেফটি সার্কল সম্পর্কে অবগত করা একান্ত জরুরি। গুড টাচ এবং ব্যাড টাচ সম্পর্কে বারবার বলা, সোশ্যাল মিডিয়া বা অন্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ওরা কী দেখছে, সেদিকে সদাসতর্ক থাকা দরকার। সন্তানের বোঝার ক্ষমতা অনুযায়ী তাকে বয়সোচিত আদবকায়দা, পিরিয়ড, হস্তমৈথুন ইত্যাদিও শেখানো প্রয়োজন।

পাশাপাশি বিশেষভাবে সক্ষম সন্তানকে 'না' বলতেও শিখুন। বিষয়টা খুব একটা সহজ নয়। কারণ ওরা যে সুখ থেকে বঞ্চিত, সব বাবা-মা-ই সেই অভাব তাঁদের স্নেহ, ভালবাসা দিয়ে মেটাতে চেষ্টা করেন। কিন্তু কিছু কিছু আচরণ, অভ্যাস, খাদ্যাভ্যাস থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়াটাও ওদের ভালর জন্যই জরুরি। মনে রাখতে হবে, বিশেষভাবে সক্ষম বাচ্চাদের চিন্তাভাবনা সরল হলেও, ম্যানিপুলেট করার কৌশল ওরাও জানে। তাই 'না' বলার আগে নিশ্চিত হয়ে নিন যে, ওর বায়না বা জেদের কাছে সহজে পরাজয় স্বীকার করে নেবেন না। কারণ যদি তা করেন, তাহলে সেটাই অভ্যেসে পরিণত হবে। আপনি না বলবেন, তারপর ও জেদ করবে এবং ক্রমে আপনিও পরাজয় মেনে নেবেন। না বলার অর্থ যেন না-ই হয়, সেটা খেয়াল রাখতে হবে। এতে কঠিন সময়েও অনুশাসনের মধ্যে থাকবে ওরা।

না শুনে যদি বাচ্চা রাগারাগি করে বা তাদের মনখারাপ হয়, সেক্ষেত্রে কোনও কটু কথা বলবেন না, বিশেষ করে যা বলতে চান না। রাগের মাথায় জিনিসপত্র ভাঙলে বা মাটিতে শুয়ে গড়াগড়ি খেলেও সিদ্ধান্তে অটল থাকুন।

আশিস চক্রবর্তী, *স্পেশ্যাল পেরেন্ট*

আমার ছেলে আকাশের জন্মের ছ'মাসের মাথায় সেরিব্রাল পলসি ধরা পড়ে। এই অসুখে মূলত মোটর ফাংশন কাজ করে না। ফলে হাঁটাচলা, কথা বলা কোনওটাই স্বাভাবিকভাবে হয় না। সবকিছুই ওদের শেখাতে হয়। আকাশ যেমন প্রথম হাঁটতে শেখে পাঁচ বছর বয়সে। শারীরিক প্রতিকূলতা তো ছিলই, তবে আমরা অভিভাবক হিসেবে সবচেয়ে বেশি বাধা পেয়েছি সমাজ থেকে। ওর আইকিউ বরাবরই অ্যাবাভ অ্যাভারেজ ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও, শুধুমাত্র ও ঠিকমতো দাঁড়াতে বা হাঁটতে পারে না বলে, প্রচুর স্কুল ওকে রিফিউজ করে। শেষ পর্যন্ত সল্টলেকের একটি স্কুলে ভর্তি করাই। প্রত্যেক ক্লাসেই ও টপার ছিল। তবুও বহুবার ওই স্কুল কর্তৃপক্ষ ওকে টিসি দিতে চেয়েছে। যদিও ওর সহপাঠী এবং স্কুলের শিক্ষকদের কাছ থেকে প্রচুর সাহায্য পেয়েছি আমরা। ওই স্কুল থেকেই ও উচ্চ মাধ্যমিক দেয়। ৯৩.৫% মার্কস পেয়ে বি.কম অনার্সে ভর্তি হয়। তারপর ক্যাটের প্রিপারেশন নেয়। দেশের অন্যান্য প্রান্তের তিনটে আইআইএম থেকেও কল পেয়েছিল। কিন্তু ও কলকাতা থেকেই এমবিএ করার সিদ্ধান্ত নেয়। এই বছর ও এমবিএ শেষ করেছে। ওর ইচ্ছে কলেজে পড়ানোর। আপাতত সেই লক্ষ্যেই এগোচ্ছে। নিজের প্রায় সব কাজই ও নিজে করতে পারে। আর এর প্রায় পুরো কৃতিত্বই ওর মায়ের। আমার স্ত্রীর (বহ্নি চক্রবর্তী) অসম্ভব মনের জোর। কখনও কখনও আমিও হাল ছেড়ে দিতাম, কিন্তু ওর মনোবল ভাঙেনি। দীর্ঘদিন ধরে ধৈর্য ধরে ও সব শিখিয়েছে। ছেলেকে স্কুলের গেট অবধি পৌঁছে দেওয়া থেকে কোন থেরাপিতে একটু উপকার পাবে, সেই সব খবর জোগাড় করা, অন্যান্য স্পেশ্যাল পেরেন্টদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা, সবটুকুই ও করত। স্কুলে আজীবন আকাশের ১০০% অ্যাটেন্ড্যান্স ছিল। আকাশেরও অবশ্যই কৃতিত্ব রয়েছে। সেরিব্রাল পলসি নিয়েও যে ও এতদূর এগোতে পেরেছে, এটা ভাবলে সত্যিই গর্ব হয়। আমার মতো যাঁরা স্পেশ্যাল পেরেন্ট রয়েছেন, প্রত্যেককে একটাই কথা বলব যে, লড়াইটা সোজা নয় ঠিকই। তবে মনের জোর নিয়ে এগিয়ে গেলে নিশ্চয়ই সাফল্য আসবে। সমাজের মূলস্রোত থেকে নিজেদের সরিয়ে নেবেন না। নিজের উপর এবং সন্তানের উপর আস্থা রাখলে সব বাধাই পেরিয়ে যাবেন।

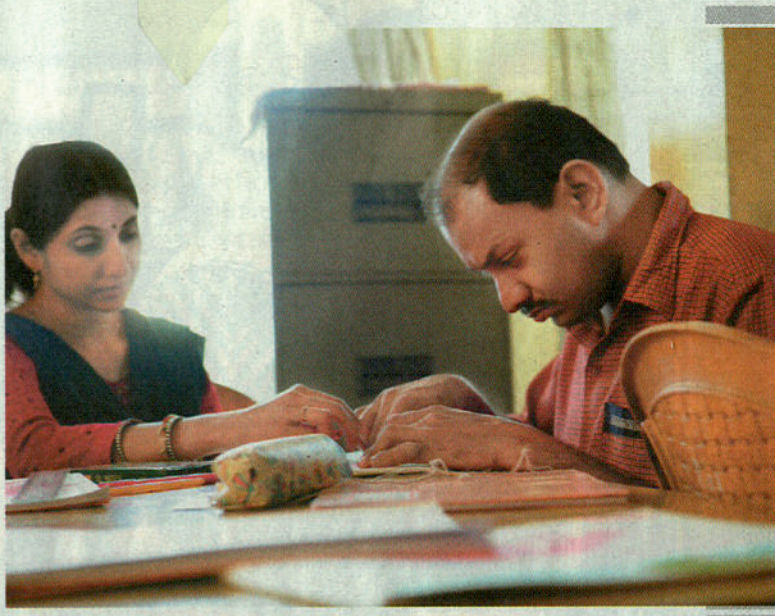

বাবা-মায়েদের ভাল থাকাও জরুরি

বিশেষভাবে সক্ষম বাচ্চাদের অভিভাবকত্ব মুখের কথা নয়। মানসিক টানাপড়েন তো রয়েইছে, পাশাপাশি সময়ে-অসময়ে ক্লান্ত লাগতে পারে, হতাশা ভিড় করতে পারে মনে। তাই বাবা-মায়েদেরও নিয়ম করে বিশ্রাম নেওয়া দরকার। সারাদিনের বার্নআউটের জন্য নিজের জন্য কিছুটা সময় বরাদ্দ রাখুন। ১৫ মিনিট হলেও, প্রতিদিন কিছুটা সময় শুধু নিজের সঙ্গে কাটান। যা যা করতে ভালবাসেন, সেগুলো করুন। বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটানো, কফিশপে যাওয়া বা পছন্দের সিনেমা দেখাও এই বিশ্রামের অঙ্গ হতে পারে।

প্রযুক্তির দাক্ষিণ্যে, এখন বাড়ির বাইরে থাকলেও সন্তানের গতিবিধির উপর নজর রাখার সুযোগ রয়েছে। চাইলে যখন খুশি ভিডিও কল করেও দেখে নিতে পারেন, সন্তান ঠিক আছে কিনা। কাজেই কিছুটা সময় নিজের মতো করে কাটানো নিয়ে অপরাধবোধ বা দুশ্চিন্তা, কোনওটাই যুক্তিযুক্ত নয়। মনে রাখবেন, সকলেরই সাহায্যের দরকার হয়। তাই প্রয়োজন হলে কাছের মানুষ, পরিবার, পরিজন, বন্ধুদের সাহায্য নিন। ওঁদের সাহায্য পেলে আপনি খানিকটা সময় বিশ্রাম নিতে পারবেন জানলে, ওঁরাও সাহায্য করার জন্য নিশ্চয়ই এগিয়ে আসবেন। সম্ভব হলে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কেয়ারগিভারের সাহায্যও নিতে পারেন। মাঝেমধ্যে বিশ্রাম নিলে আলাদা স্ফূর্তি পাবেন। মনও ভাল থাকবে, শরীরও সুস্থ থাকবে, যা সন্তানকে ভাল রাখার জন্য জরুরি।

যোগাযোগ: ৯৮৩৬৪০৩৭৬৬
ই-মেল: askminubudhia@caringminds.co.in

বিশেষ মানুষদের কথা

সুন্দর ভবিষ্যতের লক্ষ্যে...